ভাদুগান, টাঁড় ঝুমুরের কিঞ্চিৎ প্রভাব, খোল-করতাল-কাঁসির মতো দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রাধান্য ইত্যাদি বাংলার লোকগীতিধারায় ভাদুগানের জাত চিনিয়ে দেয়। প্রকৃত লোকগানের মতোই বহু ভাদুগান মুখে মুখে রচিত হয় বলে তা স্মৃতিধার্যতাকে অতিক্রম করে বিলুপ্তও হয়ে যায়। —ড. শতঞ্জীব রাহা

ভাদুগান ঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, কাত্রগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলে ভাদ্রমাসের প্রথমদিন থেকে শুরু করে সংক্রান্তি পর্যন্ত মেয়েরা নিজেদের বাড়িতে ভাদু বা ভদ্রেশ্বরীর একটি মাটির মূর্তি গড়ে, কখনো কন্যা আবার কখনও জননীরূপে পূজা করে থাকে। নাচ-গানে ভরপুর এই লোক-উৎসব। 'ভাসান' উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয় এই উৎসবে। নদীর তীরে মেলা বসে। সারা ভাদ্রমাস ধরেই মেয়েরা ভাদুর মূর্তির সামনে নাচ-গান করে পুজো দেয়। প্রতিদিনই পুজো চলে। 'ভাদু' পরব মূলতঃ বর্ষা উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভাদুপুজো সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে যা ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে, যেমন—

মানভূম অঞ্চলের পঞ্চকোট জেলার কাশীপুর রাজ্যের রাজার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজার এক বাক্‌দত্ত রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে না হওয়ায় ভদ্রেশ্বরী প্রাণত্যাগ করে। কাশীপুরের রাজা কন্যা-শোকে-শয্যা নিলে প্রজারা তাদের আদরের রাজকন্যাকে চিরদিন মনে রাখার জন্য ভাদুর নামে একটি ব্রত পালন করার সংকল্প গ্রহণ করে। কাশীপুররাজ নীলমণি সিংহের সক্রিয় সহযোগিতায় তারা 'ভাদু' পরবের প্রচলন করে। সেই থেকেই 'ভাদু' উৎসব মহা-সমারোহে সীমান্ত বাংলা ও মানভূমের অন্যান্য অঞ্চলে প্রতি বৎসর ভাদ্রমাস ধরে মেয়েরা নাচ-গানের মাধ্যমে পালন করে আসছে। ভাদু ছিল অবিবাহিতা। তাই ভাদু উৎসবের গান-গুলিতে ভাদুর বিয়ের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ভাদ্রমাসের প্রথম দিনটি হল ভাদুর আগমনী। তাই ভাদুর মূর্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ভাদুর আগমনী গান গায়—

ভাদুরাণী আইল আজি মোদের প্রাঙ্গণে,
খুশীর জোয়ার বইল মনে মোদের
পরাণে,
মোদের ভাদুর আগমনে।
পূজা করবো সারা রাত্রি,
জ্বালিয়ে সবাই মাটির বাতি,
ফল দিয়ে করব পূজা ভাদুর চরণে।

সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া জেলার একটি অঞ্চলের ভাদুগানে শোনা যায় মাতৃহৃদয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাস—

আমার ঘরকে ভাদু এলেন
কুত্থাকে বসাব,
পিয়াল গাছের তলায়
আসন সাজাব।
না, না, না আমার সোনার ভাদুক্
কোলে তুল্যে লিব।

উপরোক্ত গানটির মধ্যে আদিবাসীদের আঞ্চলিক কথার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। আরো একটি গানে ভাদুর রূপ বর্ণনা আঞ্চলিক সুরের মর্মস্পর্শী আবেদনে অনুভব করা যায়। আঞ্চলিক ভাষায় গানটির উপস্থাপনা। যেমন—

আমার ভাদু চলেছেন লাচ্যো লাচ্যো
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ নেপুর বাজে।
ভাদুর উপের (রূপের) বাহার দেইখ্যা
উইঠলো জুয়ার মনের মাঝে।

এ ধরনের বহু গানই আছে যার মধ্য দিয়ে কুমারী মেয়েদের মনের ভাবনা চিন্তার

Scanned with CamScanner

প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ভাদুকে দেবী কল্পনা করে মেয়েরা দূরে সরিয়ে রাখেনি। নিজেদের বন্ধু, কন্যা বা মাতা বলে সম্বোধন করে কাছে টেনে নিয়েছে।

সারামাস পুজোর শেষে আসে বিষাদময় ভাদু ভাসানোর পর্ব ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে। মেয়েরা তাদের আদরিণী ভাদুকে বিদায় দিতে চোখ ভরা জল নিয়ে আসে। নদীর ঘাটে ভাদুকে নামিয়ে তারা গান গায়—

বিদায় দিব কেমনে বল না ভাদু,
মোদের মন কইর্‌ঠ্যাছ চুরি দিয়ে
তোমার যাদু।
যাচ্ছ তুমি যাও ভাদু লো আবার
আইসো ফিরে
ভুইল্যো না ভুল্যোনা ভাদু, ভুল্যোনা
মোরে।

ভাদু মূলতঃ বর্ষা উৎসব হলেও, একালের অর্ধশিক্ষিত সীমান্ত বাংলার কবিদের কণ্ঠে শোনা যায় রাজনীতি ও সমাজনীতির কথা। লোকসঙ্গীত জীবনাশ্রয়ী তাই একালে ভাদু গানের মধ্যে শোনা যাচ্ছে সমাজচেতনা বা রাজনৈতিক চেতনার কথা—

নীলাম্বরী পরবি পর ভাদু সোহাগিনী
গরীব সইদের না দেখিলে
মাইর বো ঝাঁটা কপালে আনি।

—বুদ্ধদেব রায়

সংযোজন ঃ বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত 'ভাদু' নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, অসংখ্য প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। তবু তারইমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য রামশঙ্কর চৌধুরী রচিত 'ভাদু ও টুসু' শীর্ষক গ্রন্থটি (১৯৭৭) এবং যুধিষ্ঠির মাজী রচিত 'ভাদুগীতির ইতিকথা' (১ম খণ্ড) প্রকাশকাল ১৯৮৫। ভাদু নিয়ে যুধিষ্ঠির বাবুই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার গৌরবের অধিকারী। —সম্পাদক

ভাসানি জাল ঃ ভাসানি জাল রাজবংশী সম্প্রদায়ের মাছ ধরার একটি অন্যতম উপকরণ। আকারে এটি একটি সম মাপের চতুষ্কোণ জাল। এটি বাঁশ দিয়ে তৈরী। একটি লম্বা বাঁশের টুকরোতে আটকে এই জালটিকে জলে ডোবাতে হয়। মাছ জালের মধ্যে ঢুকে আটকে পড়ে। কোচবিহার বা জলপাইগুড়ি জেলাতে ভাসানি জালের আকার ভিন্নতর দেখা যায়।

—প্রমোদ নাথ

ভাঁজো ঃ রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করে বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত এটি একটি নারীব্রত। কোন কোন অঞ্চলে এটি শস পাতার ব্রত নামেও প্রচলিত। পর্যাপ্ত শস্যকামনা এবং শস্য উৎপাদনের যে আনন্দ, এই ব্রতের নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী (মন্থনা ষষ্ঠী/চর্পরাষষ্ঠী) থেকে আরম্ভ হয়ে পরের শুক্লা দ্বাদশীতে এই ব্রত শেষ হয়। ব্রত আরম্ভের পূর্বদিনে একটি পাত্রে মুগ, মটর, ছোলা, অড়হর ও কলাই—এই পঞ্চশস্য ভিজিয়ে রেখে পরদিন ষষ্ঠী পুজোয় সেগুলির নৈবেদ্য সাজিয়ে, কিছু শস্য সরষে এবং ইঁদুর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একটি মাটির সরাতে রাখা হয়। তারপর প্রতিদিন স্নান করে মেয়েরা দ্বাদশীর দিন পর্যন্ত অল্প অল্প জল দিয়ে সব শস্য অঙ্কুরিত হলে, বছরটি পর্যাপ্ত শস্যশালিনী হবে মনে করে পরবর্তী শুক্লা দ্বাদশীতে চাঁদের আলোয় নাচ-গানের মধ্য দিয়ে একটি উৎসবের আয়োজন করে। উঠানের মাঝে একটি মাটির নিকানো বেদির চারিদিকে মেয়েরা প্রত্যেকের সরাগুলি সাজিয়ে দিয়ে ঐ বেদিতে পিটুলির আলপনায় ইন্দ্রের বজ্র চিহ্ন এঁকে দেয়, কোথাও বা মাটির ইন্দ্রমূর্তি স্থাপন করে। তারপর উঠানের আর এক অংশে পর্দার আড়াল থেকে ঢুলিরা অনেকটা তর্জা বা

Scanned with CamScanner

দেশের সর্বত্র। তবে এর বাজনার রীতি ভিন্নধর্মী। বাউল, ফকিরা, গম্ভীরা গানে এর প্রচলন ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

এটি আনদ্ধ শ্রেণীর যন্ত্র। কাঠের তৈরী গোলাকার বেড়। এর একদিক চামড়া দিয়ে ছাওয়া থাকে। অপর দিক খোলা। আয়তনে আট থেকে দশ ইঞ্চি। কাঠের গায়ে তিন বা চার রংয়ের দাগ দেখা যায় এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। বেড় এর গায়ে গর্তে ছোটো ছোটো চারটি খঞ্জনির ছোট করতাল আটকানো থাকে। বাঁ হাত দিয়ে ধরে ও সামান্য চামড়া অংশে চাপ দিয়ে ডান হাতের তর্জনি, মধ্যমা ও অনামিকার ডগা দিয়ে সজোরে চামড়ায় আঘাত করে ছন্দবদ্ধভাবে গানের প্রয়োজন অনুযায়ী বাজান হয়। যন্ত্রটি অতি প্রাচীন। ফকির, দরবেশ, সাঁই, বাউল, আউলদের পরম সঙ্গী। অল্প জল দিয়ে চামড়ার গায়ে বুলিয়ে শুকিয়ে যাওয়া মাত্রই চাপড় দিয়ে সুর ঠিক করে নিতে হয়। তারপরেই এটি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। —স্বপন মুখোপাধ্যায়

খন-১ ঃ খণ্ড বা খণ্ড কাহিনীর অপভ্রংশ হল খন [উত্তরবঙ্গের রংপুর] দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট পালারূপে এই নাট্যপ্রকার প্রচারিত হয়। পল্লীর সাময়িক ঘটনা এর প্রধান অবলম্বন। গীতিপ্রধান এই নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার সংলাপ ব্যবহৃত হয়।

গীতিপ্রধান এই নাট্যগুলির কোন গান জনপ্রিয় হয়ে গেলে তা গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মঙ্গল পালার নাম বিস্মৃত হয়ে লোকে এই গানগুলিই গেয়ে থাকে। ফলে জনপ্রিয় পালা অন্য দলও প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় করে।

যেহেতু গানের মাধ্যমে এর কাহিনী সহজেই প্রচারিত হতে পারে—তাই এর যায়। এর কাহিনীতে সাময়িকতা থাকায় তা সমাজ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রচারধর্মিতার জন্য এই খণ্ডগানের এক প্রকার নৈতিক দিক দেখা যায়। ফলে অবৈধ ক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানুষ সজাগ হয়। বিনোদন করতে এসে এই নীতিবোধের জাগরণ সবমানুষ ভাল চোখে দেখে না। তাই ইদানীং এর প্রচারে কেউ কেউ বিরুদ্ধতাও করেন। হয়তো এই কারণেই আগামী দিনে তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না।

প্রচলিত অন্যান্য নাট্য প্রকরণ অপেক্ষা এই গান সমাজ ও জীবন নির্ভর বলে এর শিল্প ও নাট্যগুণকে তাই বলে অস্বীকার করা যায় না। এর সুর ও অভিনয় সহজেই দর্শকদের মনকে প্রভাবিত করে। ফলে সে নিজেও পরবর্তী কালে এ জাতীয় নাট্যরচনায় প্রেরণা পায় ও অভিনয়ে অগ্রসর হয়—এ ভাবেই পালাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। তাই পালাগুলিতে নীতি কথার ঈষৎ বিস্তার হলেও অন্তিমে তা দর্শকদের মনে এক করুণ রসের সঞ্চার করে তার রসকে স্থায়ী করে তোলে।

যে সমাজের জন্য এর রচনা বা অভিনয় তা মূলতঃ কৃষিজীবি। তাদের পক্ষে এ গান তাই সার্থক। এ গান নায়িকা প্রধান—প্রধানত স্বৈরিণী নারীর কাহিনীই এর প্রধান উপজীব্য। পরিবার বা সমাজ গঠনে তাই এই জাতীয় কাহিনীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। স্বৈরিণী— শব্দের অপভ্রংশ সরী। বুলোসরী পালার নাম থেকেই এর বিষয়বস্তু বোঝা যায়। পালাটিয়া গানের একটি বিশেষ প্রকরণের সঙ্গে এর বিষয় বস্তুর সাদৃশ্য দেখা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকায় যেমন নারীই হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র খনও প্রায় তদ্রূপ। তবে উভয়েরই উপস্থাপন

Scanned with CamScanner

ভিন্ন রীতির। ক্লেদ ও ব্যভিচার প্রকাশ যেখানে পালার প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে এই পালা যে কতটা সমাজের দর্পণ রূপে কাজ করছে তা বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা প্রভৃতির মত তা দেবনির্ভর নয় বলেই খনের এই স্বাতন্ত্র্য।

—শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক

খন-২ ঃ লোকনাট্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত ক'রে বিচার করা যায়। একটি আনুষ্ঠানিক, অন্যটি অনানুষ্ঠানিক। পরিষ্কার করে বলতে গেলে এটি যখন পরিবেশিত হয়, তখন দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতকগুলি ধর্মীয় আচারের (Rites Rituals) সঙ্গে এগুলি যুক্ত। কোনো তিথি বা উপলক্ষ্যে এগুলি পরিবেশিত হয়। যেমন গাজন উপলক্ষ্যে ব-খেলা, ভাসান। অনেকক্ষেত্রে গাজনের বা মনসার মাহাত্ম্য কীর্তিত না হলেও উপলক্ষ্য ছাড়া এগুলি অভিনীত হয় না।

আবার অনেক লোকনাট্য আছে যার অভিনয়ের আগে অবশ্য কিছু পুজো-আচার পালনীয়। অভিনয়ের উপলক্ষ্য হোতার ভক্তিপূত মানসিক অভিলাষ। যেমন উত্তরবাংলার কুশান, রামবনবাস প্রভৃতি। এইরকম অভিনয়যোগ্য লোকনাট্যকে আনুষ্ঠানিক বলা যেতে পারে।

যে সব লোকনাট্য অভিনয়ের সঙ্গে কোনো বিশেষ তিথি বা উপলক্ষ্য নেই বা অভিনয়ের পূর্বে কোনো পুজো-বিধি পালিত হয় না বা হোতার মানসিক অভিলাষ কোনো বিশেষ ধর্মীয় আচারকেন্দ্রিক ভক্তিপূত নয়, যা বছরের যে-কোনো সময় অভিনীত হবার অবাধ অধিকারভুক্ত, তাকেই অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য বলা চলে।

'খন্' এমনই একটা অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য।

'খন্' অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোকসমাজের অতি প্রিয় এক নাট্যরূপ। লোকসমাজের ভাষায় 'খন্' গাউন। 'খন্' শব্দটি জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'ক্ষেত' অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু সেখানে 'খন্ গাউন' অপ্রচলিত ও অপরিচিত। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে সংগৃহীত একটি 'নটুয়া' গানের পালায়, 'খণ্ড' কথাটি পাওয়া যায়। 'খণ্ড' হলো ঘটনা। একটি নির্দিষ্ট কৌতূহলজনক ঘটনা বোঝাতে সাধারণ বাংলায় 'কাণ্ড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ একটা কাণ্ড হয়েছে। তেমনি পশ্চিম দিনাজপুরের দেশীপলিরা বলেন 'খণ্ড'।

খণ্ড যখন গানে বাঁধা পড়ে, তখন তা 'খন'। ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারেও 'খণ্ড' থেকে 'খন' হতে পারে।

তবে 'খন' আবার বিশেষ অর্থ পায়। দেশীপলি অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের কাছে এর অর্থ—কলঙ্ক জনিত সত্য ঘটনা। এরূপ সত্যঘটনা অবলম্বনে 'খন' হয়। স্থান কাল এমনকি পাত্র-পাত্রীর নাম-ধাম পর্যন্ত অবিকলভাবে 'খন'-এ ধরা পড়ে। তবে ইদানীং এসব নাম ধাম গোপন রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নবান্নের পর কয়েক মাস কৃষকের অবসর। এই অবসরে গ্রামে বা গ্রামান্তরে ঘটে যাওয়া 'খণ্ড'গুলির পর্যালোচনা চলে। ঘটে যাওয়া ঘটনাটি যেমন দেখেছে বা জেনেছে, তেমন করে সাজায় পরপর কতকগুলি গানের সহায়তায়। অর্থাৎ কাহিনী কাঠামো হলো গান। এই গানগুলি খনের পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি। আসরে অভিনয়কালে কুশীলব এই গানের কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে উপস্থিত মতো গদ্য সংলাপ জুড়ে দিয়ে কাহিনীর পূর্ণতা দেয়। শুধুমাত্র গীতিসংলাপ পূর্ণ (অর্থাৎ কাহিনী কাঠামো) অনেক পালা যেমন রয়েছে, তেমনি গীতি ও কথ্য সংলাপযুক্ত পূর্ণাঙ্গ পালাও লভ্য। গীতি সংলাপগুলো ইদানীং খাতায় লিখে রাখা হয়।

Scanned with CamScanner

কার্তিক মাসের শেষভাগ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে কৃষকের যে অবসরকাল এই সময়ই 'খন গাউন'-এর সৃষ্টি ও প্রচার।[১] প্রতি বছরই গ্রামে গ্রামান্তরে নানান খণ্ড হয়। তা থেকে নির্বাচিত খণ্ড নিয়ে 'খন' তৈরি হয় বছর বছর—এক বা একাধিক। নতুন 'খন্' পুরোন 'খন'-এর স্থান দখল করে। এই সময়ই দেখা যায় প্রায় প্রতিদিনই খন্-এর দল কাঁধে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা. আর তাল (করতাল) নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। এগুলো সম্পন্ন কোন গৃহস্থের অঙ্গনে পরিবেশিত হয়। পুরানো খন যে সবসময়ই একেবারে বাতিল হয়ে যায় তা নয়, নতুন খনের পাশাপাশি বহু পুরানো খনও এই সময় শোনা যায়। পুরানো খন-এর অস্তিত্ব নির্ভর করে তার জোরালো কাহিনী, নাটকীয়তা ও গঠন পদ্ধতির ওপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঢাকোশোরী' উল্লেখযোগ্য।

অবসরকালে কৃষক শ্রমের ক্লান্তি ভুলতে চায়, আবার নতুন করে শ্রমের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ তার প্রয়োজন। সমাজে অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে যে সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, তার কাছে গান কোন বিনোদন বা নিছক প্রমোদের বিষয় নয়। এও তার প্রয়োজন। 'খন্ গাউন' তার এই প্রয়োজন মেটায়। সেই সঙ্গে তাকে দেয় সমসাময়িক নানা ঘটনার খবর এবং অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তার নীতিবোধ, পরিশুদ্ধ করে তার চিত্ত। তাই খনের দুই রূপ ঃ ১. সাংবাদিকতা ও ২. কাব্যময়তা।

এছাড়া 'খন'-এর পালাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক, খিসা, দুই, শাস্তোরী।

'খিসা' শব্দটি বোধ করি ফরাসী কিস্সা বা কেচ্ছা থেকে এসেছে। সমাজ অস্বীকৃত অবৈধ প্রণয় বা যে কোন কলঙ্কজনক 'খণ্ড'ই 'খিসা'। এ ধরনের খনগুলো শুধুমাত্র 'খিসা' নামেও পরিচিত বা প্রচলিত। 'শাস্তোরী' শব্দটির উৎস শাস্ত্রীয়। কোন একটি ঘটনা অবলম্বনে শাস্ত্রীয় তর্ক আলোচনা এর প্রধান বিষয়। তা সত্ত্বেও খন-এর বৈশিষ্ট্য এতে ষোল আনা। এ ধরনের গানগুলো শুধুমাত্র 'শাস্তোরী' নামেও খ্যাত।

'খন'-এর খিসা এবং শাস্তোরী উভয়েরই পালাগুলোর নামকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নায়িকার নাম অনুসারে। নামান্তে 'সরী' বা 'শোরী' কথাটা যুক্ত। যার ফলে এইগান 'সরী' বা 'শোরী' গান নামেও প্রচলিত। নামান্তে ঈশ্বরী গৌরবার্থে যুক্ত হতে পারে। তা থেকে শোরী, তবে খন গানের নায়িকা অর্থাৎ কলঙ্কজনক ঘটনার প্রধানা নারীটির নামের ক্ষেত্রে 'সরী' ব্যবহৃত হয়। যে নারী স্বাভাবিক জীবনযাত্রা (এ জীবনযাত্রা Sanskritization লব্ধ) থেরে সরে গিয়েছে। সে 'সরী'।

এবার 'খন' গানের আসরের কথায় আসা যাক।

লোকনাট্যে মঞ্চ ঃ কুশীলব (গাইন), বাদ্যযন্ত্রী (বাইন), দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক এই নিয়ে হলো আসর। খন এর মঞ্চ নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। সমস্ত খাঁটি লোকনাট্যের মঞ্চের যা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বৃত্তাকার, খন-এও তাই। বৃত্তাকার মঞ্চের মধ্যস্থলে বাদ্যযন্ত্রী কুশীলবের অবস্থান।

খন গানের কুশীলব সমস্ত খাঁটি লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তবে খন গানে পৃথকভাবে কোন প্যাংচিয়া বা খিচরিয়া নেই। কোন একটি বিশেষ চরিত্র এই প্যাংচিয়ার ভূমিকা পালন করে। 'ছোকরা' নারী চরিত্রের সঙ্গে একীভূত। অর্থাৎ খন-এর পালায় নারী চরিত্রগুলি পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয়। তারা নাচ গান করে ও গদ্যে সংলাপ বলে। তারা 'ড্রেস' দিয়ে শাড়ি

Scanned with CamScanner

পরে। হাতে কাঁচের চুড়ি গলায় মালা, চুল খোঁপা করে বাঁধা, গায়ে রঙীন ব্লাউজ। দেশী-পলিরা সমাজজীবনে যে বুক থেকে জানু অবধি ঢাকা কাটা কাপড় তথা বুকানি পরে, তা কচিৎ বা কদাচিৎ দেখা যায়, তবে এ পোষাক সাধারণতঃ দর্শকের হাস্যরস সৃষ্টি করে।

'নাহিড়ী' বা নায়িকা, মুড়ি বা নায়ক এবং যে চরিত্রটি 'ওসিয়া' তার মুখে জিঙ্ক অক্সাইড পাউডার দিয়ে সাদা করে দেওয়া হয়। নায়কের কিংবা অন্যান্য চরিত্রের পোশাক চরিত্রানুযায়ী, কোনো জমকালো ব্যাপার নেই। কুশীলবরা সাজ পোশাক করে মঞ্চের মধ্যস্থলে বাইনের সঙ্গে বসে থাকে। অভিনয়কালে উঠে এসে অভিনয়ে অংশ নেয়। তবে ইদানীং ভিন্ন সাজঘর হয়েছে। সাজঘর থেকে তারা দর্শকের মধ্য দিয়ে একফালি সরু পথে মঞ্চে যাতায়াত করে।

'খন'-এ বাদ্যযন্ত্র হলো—হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, করতাল, বাঁশি। তবে হারমোনিয়াম অন্ততঃ ৫০ বছর আগে চালু ছিল না। ডুগি-তবলাও নয়। খোল বা ঢোল, বাঁশি ও করতালই ছিল এর বাদ্যযন্ত্র।

বাদ্যযন্ত্রীরা একজন বাজনা দিয়ে পালা অভিনয়ের সূচনা করে। কুশীলবরা এসে দশদিক আসর বন্দনা গান করে, পাত্রপাত্রীরা গানের প্রতিটি চরণের পুনরাবৃত্তি করে এবং প্রয়োজনীয় ধুয়া তোলে। তারা মঞ্চের মধ্যস্থলে গোল ও জড়োসড়ো হয়ে বসে।

খন্-এর দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক, কুশীলব ও বাদ্যযন্ত্রী সকলেই একই প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মানুষ। তবে, পৃষ্ঠপোষক তুলনামূলকভাবে আর্থিক সামর্থে সামান্য শক্তিশালী। দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক উভয়েই খন-এ অংশগ্রহণ করে থাকে কখনো কখনো। পালাগুলির সমীক্ষায় এটা স্পষ্টতর করা যায়। বাদ্যযন্ত্রী কুশীলব নিয়ে খন-এর যে দল—তার নেতার নাম 'মাখি'। ইদানীং 'ম্যানেজার' শব্দটি চালু হয়েছে।

খন-এর কোন কোন পালা এমন জনপ্রিয় হয়ে পড়ে যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বৃহত্তর এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়ে। সে তখন কোন সীমানা মানে না। তবে লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটি দেশী-পলি অধ্যুষিত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। তবে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, দেশী পলি রাজবংশী সম্প্রদায়ের বহুবিধ আচার মুসলমান সহ অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়েও দেখা যায়। এইসব এলাকার অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ও খন্‌কে আপনার বলে মনে করে। এমনকি এই একই অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ও খন-এ অংশ নেয়। পালা তৈরী করে। তাদের সমাজেরও 'খণ্ড' দিয়ে খন্ বাঁধা হয়। বিশেষভাবে এ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক গড়নটি দেশী পলিদেরই অনুরূপ।

খন-এর পালারম্ভে বন্দনা-গীতি। নায়ক নায়িকা অবশ্যই এই বন্দনায় মুখ্য ভূমিকা নেয়। তারপর মূল কাহিনীর সূত্রপাত। ১. আসরভিত্তিক তাৎক্ষণিক রচিত গদ্য সংলাপ, ২. গীতি সংলাপ যা পূর্বেই তৈরী, ৩. গীতি সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয় নৃত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—নায়ক-নায়িকার হাতে মুঠো করে ধরা থাকে একটি লাল কাপড়ের টুকরো। এবং গীতি সংলাপের ক্ষেত্রে হাত মুঠো করে একবার মুখের কাছে তুলে ধরে (অনেকটা কিছু ঘোষণা করার ভঙ্গি), আবার নীচে নামায়। অনেকটা হাতির শুঁড় তোলা নামানোর মত। কুশীলবদের মঞ্চ প্রদক্ষিণের মধ্যেও দেখা যায় হাতির গতিভঙ্গি। গানের সুর যেন হাতির পিঠে চড়ে বসা মাহুতের গানের মতো, ধীর লয়, করুণ।

খন-এর কাহিনীগুলি প্রণয়রসে ভরপুর এবং এগুলি সবই রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী।

Scanned with CamScanner

মূলত এই দুই ধারায় বাংলার মৃৎশিল্পের বিকাশ লক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে বাঁকুড়া মৃৎশিল্পধারাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ভাবপ্রধান বাঁকুড়া রীতির প্রধান যে শিল্পরূপ ঘোড়া ও হাতী তা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে পাঁচমুড়া ও সোনামুখী স্থান দুটি বিশেষ উল্লেখ্য। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পধারায় যে মাটির পুতুল ও ভাস্কর্য তৈরি হয় সে সবই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সযত্ন প্রয়াসে নির্মিত বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ। নিখুঁত বাস্তবানুকরণই সে সকল মৃৎমূর্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া বাংলার মৃৎশিল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রতিমা নির্মাণ। মাটি দিয়ে পুরাণকথা অনুসারে কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়। বর্তমানে অবশ্য নানারূপ আধুনিক শৈলীর সংযোজন হয়েছে। প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে কলকাতার কুমোরটুলি আজ সবিশেষ উল্লেখ্য একটি স্থান।

একদিন শুধু প্রয়োজন পূরণের জন্য পাত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে যে শিল্পধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিচিত্রধারায় বহুধাবিভক্ত সেই মৃৎশিল্পের বিকাশ আজও অব্যাহত। —ড. সঞ্জয় দে

মেছেনী (১) ঃ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নারীদের মধ্যে এই ব্রতানুষ্ঠানটি প্রচলিত। 'মেচ' উপজাতির জলের আরাধ্যাদেবী 'মেচনী'। এই 'মেচনী'ই পরিবর্তিত উচ্চারণে 'মেছেনী' হয়েছে। আসাম ও উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী 'মেচ' উপজাতিদের কাছ থেকেই এই ব্রতটি আগত। 'মেছেনী' ব্রতের অপর নাম ভেদৈ খেলী বা ভেদই খেলী। উত্তরবঙ্গে তিস্তাকে জলদেবী মনে করার জন্য তিস্তার উদ্দেশে এই ব্রত করা হয়।

সারা বৈশাখ মাস ধরে (বা বৈশাখের কিছুদিন) মেয়েরা দলবদ্ধভাবে এই ব্রত করে থাকে। ব্রতের মূল ব্রতিনীকে বলা হয় 'মাড়েয়ানী'। তিস্তানদী থেকে তুলে আনা মাটি ও গ্রাম দেবতার থানের মাটি সমেত 'মাড়েয়ানী' তিস্তাদেবীর ডালা কাঁখে নিয়ে সকলের আগে এগিয়ে যায়। 'মাড়েয়ানী'র মাথার উপর থাকে নানারঙের রঙিন ও ফুল দিয়ে সাজানো একটি ছাতা। শোভাযাত্রা করে চলার সময় 'মাড়েয়ানী'র পিছনে ব্রতিনীরা দই ও ফুলমাখা আতপচাল বৃষ্টির মতো বর্ষণ করতে থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠান কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। 'নামানি' পর্যায় দেবী তিস্তাকে স্বর্গ থেকে নামানোর গান ও অনুষ্ঠান। দেবীকে বরণ করার জন্য গান করা হয় 'চুমানি' পর্বে। 'রাস্তাহাঁটা', 'পথবেড়ানিয়া' বা 'পাথারিয়া' পর্ব অনুষ্ঠিত হয় দলবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা করে চলার পথে। এইসময় দুইমেছেনী দলের দেখা হলে পরস্পরে তর্ক-বিতর্কে গানের লড়াই জমে ওঠে। 'বাড়িঢুকা' পর্বে গৃহদ্বারে গানগাওয়ার অনুষ্ঠান হয়। গৃহাঙ্গনে দেবী তিস্তার ডালা নামানো হয় এবং গৃহিনী উঠানে প্রচুর জল ঢেলে দেন। স্থানটি কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। এর ওপর চলে 'নাচানিয়া' পর্বটি। 'নাচানিয়া' পর্বটি নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত। মেয়েরা গোল হয়ে দু'পা জোড়া করে নাচতে ও গাইতে থাকে। এরপর 'উঠানিয়া' পর্বে সে বাড়ি থেকে গান গেয়ে তিস্তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এই ব্রতের শেষ অনুষ্ঠান 'সাতসিনানী' বা 'ভুরাভাসানী'। একটি ছোট ভেলা (ভুরা) ধূপ-দীপ ও রঙিন কাগজে সজ্জিত করে সন্ধ্যাবেলায় দেবী তিস্তার উদ্দেশে ভাসানো হয়। ব্রতিনীরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে চাল সংগ্রহ করেছিল, তাই দিয়ে নদীর ধারে বনভোজন করে এবং স্নানশেষে বাড়ি ফেরে।

এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হোল কৃষিকর্মের জন্য অধিক জল পাওয়া।

Scanned with CamScanner

তিস্তানদীকেই ঐ অঞ্চলে জলের প্রধান উৎস মনে করা হয়। তাই তিস্তাই জলদেবী হয়েছে এ অঞ্চলে। আর নারীর সঙ্গে কৃষিকাজ ব্যাপারটি জড়িত থাকায় নারীই সারামাস ধরে জলের প্রার্থনায় এই ব্রত করে থাকে।

—ড. অমিতা চৌধুরী

মেছেনী (২) ঃ 'মেচেনী' রূপেও উচ্চারিত হয়। নামান্তর 'ভেদৈ খেলী'। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের প্রধানতম নদী তিস্তার উদ্দেশে, প্রতিবৎসর গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে, দলবদ্ধরূপে, রাজবংশী স্ত্রীলোকদের ব্রতানুষ্ঠান। অনুমান মেচ উপজাতির জলোপাসনা এর পেছনে ক্রিয়াশীল। বোড়ো ভাষায় 'দৈ' অর্থ জল। 'তিস্-তা' শব্দও জলবাচক। একমাস জুড়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে, পথে-পথে ভ্রমণ করে, নেচে-গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে, শেষ দিন কোনো নদী বা জলাশয়ে গিয়ে সংগৃহীত উপচার দিয়ে পুজো নিবেদন করা এবং রান্না-বাড়া করে খাওয়া-দাওয়া হয়। এই শেষ অনুষ্ঠানের নাম 'সাতসিনানী'। মূল পূজারিণীকে বলে 'মাড়েয়ানী' (অর্থাৎ মণ্ডপের অধিকারিণী)। একটি ছাতাকে নানা রঙে চিত্রিত এবং ফুলমালায় সজ্জিত করে নেওয়া হয়। সেই ছাতা 'মাড়েয়ানী' বহন করে দলের আগে-আগে চলে। তার কাঁকালে থাকে দেবীর ডালা। এই ডালায় মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি থাকে। তার মধ্যে তিস্তা নদী থেকে তুলে আনা কিছু মাটি থাকে—তাইই দেবী তিস্তার প্রতীক। দলের আর সবাই পথ চলতে থাকবার সময় নিজের নিজের কোঁচড় থেকে ওই ছাতার ওপর চাল ছড়াতে থাকে—যেন বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টির অনুকরণ তিস্তার জলের উৎসকে নির্দেশ করে। তিস্তাকে সধবা রমণী ও বুড়ী রূপে কল্পনা করা হয়। তাঁরা পাঁচ বোন। এই পাঁচ বোন—ধান গাছের পাঁচটি স্তর। এই ব্রতের গানের কতকগুলি পর্যায় আছে। স্বর্গ থেকে দেবী তিস্তাকে মর্তে অবতরণের জন্য অনুরোধের গানকে বলে 'নামানী'। তাঁকে বরণ করবার গান —'চুমানী'। গৃহস্থের বাড়িতে দেবীর ডালা স্থাপন করাকে বলে—'বসানী'। বাড়িতে ঢোকার সময় যে গান গাওয়া হয়, তাকে বলে 'বাড়ি ঢুকা গান'। পথে চলতে চলতে যে গান গাওয়া হয়, তাকে বলে 'পাথারিয়া' বা 'পথ বেড়ানী' বা 'রাস্তা হাঁটা' গান। গৃহস্থ বাড়িতে দেবীর ডালা নামিয়ে, অঙ্গনে প্রচুর জল ঢেলে, বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে, ঘড়ির কাঁটার চলনের ভঙ্গিতে, কোণাকুণি দেহভঙ্গি করে, দুহাতে রাজবংশী স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র ('কোতা, 'পাটানী') ওড়াতে-ওড়াতে যে গান গাওয়া এবং নাচা হয়, তাকে বলে 'নাচানী' গান। সাময়িক অনেক ব্যাপার 'মেছেনী' গানের বিষয় হয়। এছাড়া থাকে নারীর জীবনের সুখ-দুঃখের গান। পথে চলতে চলতে অন্য কোনো দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সেখানেই দুই 'মাড়েয়ানী'র মধ্যে গানের লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই গান কবিগানের মতো। উপস্থিত ক্ষেত্রেই গানে-গানে প্রশ্ন এবং গানে-গানে তার উত্তর দিতে হয়। মাড়েয়ানীর দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও সঙ্গীত প্রতিভার বিচার এর দ্বারা হয়ে থাকে। কখনো বা অশোভন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ে। 'নাচানিয়া' বা 'নাচানী' গানের সঙ্গে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। কেবল করতালি দেওয়া হয়। এ গানের তালকে তাই 'থাপুড়ি' বলে। নাচবার সময় দু'পা জোড়া করে রাখা হয় এবং কখনোই সেই পা মাটি থেকে তোলা হয় না—কাদার মধ্যে পা ঘষে-ঘষে ঘুরতে ঘুরতে নাচা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটিই অনুকরণাত্মক যাদু অনুষ্ঠান এবং এর মূল উদ্দেশ্য অধিক শস্য ফলানো।

—ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক

Scanned with CamScanner

মেছেনি ব্রত, নৃত্য গীতানুষ্ঠান ঃ উত্তরবঙ্গে তিস্তাবুড়ীকে দেবী জ্ঞানে উপাসনা করা হয়। এই উপাসনার অন্যতম অঙ্গ হল মেছেনি ব্রত। সাধারণত বৈশাখ মাসের কোনো এক সময়ে পল্লীর মেয়েরা দলবদ্ধভাবে মেছেনি ব্রত পালন করে। দলের নেত্রী 'মারেয়ানি' নামে পরিচিত। মারেয়ানির নেতৃত্বে যে নৃত্য গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তার আটটি পর্যায়—নামানি, পথ বেড়ানি, বাড়ি ঢুকানি, বসানি, চুমানি, নাচানি, উঠানি এবং ভুরা ভাসানি। নামানি হল নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম দেবতার থানে তিস্তা বুড়িকে স্বর্গ থেকে নামানোর গান। তিস্তাবুড়ির প্রতীক একটি মাটির ভেলাকে বাঁশের চুবড়িতে করে তেল, সিঁদুর, দুধ, চাল দিয়ে নিয়ে গিয়ে নামানি গান গাওয়া হয়। এরপর এই চুবড়ি লোকদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন যাবৎ উপাসনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। এইভাবে বাড়ি নিয়ে যাবার পথে যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে পথ বেড়ানি গান। বাড়িতে ঢোকার সময়ে গাওয়া হয় বাড়ি ঢুকানি গান। তিস্তাবুড়িকে কোনো বাড়িতে বসানোর জন্য গাওয়া হয় বসানি গান। চুমানি গেয়ে বাড়ির লোকেরা বা তাদের পক্ষে মারেয়ানি তিস্তাবুড়িকে বরণ করে নেয়। তারপর অনুষ্ঠিত হয় নাচের সঙ্গে নাচানি গান। উঠানি গান গেয়ে তিস্তাবুড়িকে কোনো বাড়ি থেকে উঠিয়ে আনা হয়। এইরূপে কয়েকদিন চলার পর ভুরা ভাসানি গান গেয়ে মেয়েরা নদীতে স্নান করে। ব্রতেরও শেষ হয়।

মারেয়ানির মাথায় থাকে বিচিত্র বর্ণের একটি ছাতা। তার ডান কাঁধে সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকে একটি চুবড়ি। তিস্তাবুড়িকে স্বর্গ থেকে নামানোর জন্য যে গান গাওয়া হয় তা হল এই রকম—তিস্তাবুড়ি নামে রে/বাজে হীরামন বাঁশি রে।। মোর মনে নাগিয়া গেইল/গায়ের পাছোড়া হারেয়া গেইল/ গাঁয়ের গারাম সালাম রে।।

—ড. নজরুল ইসলাম

মেঘারাণীর ব্রত ও গান ঃ বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ যায় যায় অথচ দেশে এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। এমনকি মেঘশূন্য নির্মল আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ পর্যন্ত দেখা যায় না। অজন্মার হাত থেকে রক্ষা পাবার বুঝি আর কোনো উপায়ই নেই। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তে কৃষাণ ঘরের মেয়ে ও অল্পবয়সী বৌদের দেখা যায় 'মেঘারাণী'র কুলো নামাতে।

কুলো, জলঘট প্রভৃতি নিয়ে তারা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায় কখনও বা ছোটখাট নাচও দেখায়। শেষটায় একঘটি জল ঢেলে দেয় উঠোনের মাঝে—এ হল বৃষ্টির প্রতীক। পূর্ববঙ্গের এই মেঘারাণীর গানের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের 'মেছেনী'র গানের বিশেষ মিল দেখতে পাওয়া যায়। গান গেয়ে এই মেয়ের দল গৃহস্থ বাড়ি থেকে পায় চাল, তেল, সিঁদুর কখনও বা দু'চারটে পয়সা এবং পান-সুপারি।

কেউ সাতদিন, কেউ তিন দিন ধরে কুলো নামায়। সাধারণতঃ এই কুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবার ভার থাকে 'একমায়ের এক ঝিয়ের' ওপর। কোথাও কোথাও বেঙ্গাবেঙ্গির বিয়ে দেওয়ারও রেওয়াজ আছে। গৃহস্থ বাড়িতে এই দল গেলেই গৃহলক্ষ্মীরা উলুধ্বনি সহকারে তাদের বরণ করে নেয়, উঠোনে পেতে দেয় পরিষ্কার পিঁড়ি। তারাও কুলো, জলঘট সেই পিঁড়ির উপর বসিয়ে দিয়ে গান জুড়ে দেয় ঃ

হ্যাদে লো বুইন ম্যাঘারাণী
হাতপাও ধুইয়্যা ফ্যালাও পানী।
ছোট ভুঁইতে চিন্ চিনানী

সাঁওতাল মেয়েরাই পরিবেশন করে। বাড়িতে ব্যবহৃত কাঁসার বাসনপত্র এই নৃত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নৃত্য শিল্পীদের মাথায় থাকে একাধিক ঠিলি (কলসী)। ডানহাতে কাঁসার বাটি। বামহাতে কাঁসার থালা নিয়ে ধি তাং তাং তিন মাত্রার তালে সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে টুকলী পায়ে (পায়ের অগ্রভাগে ভূমি স্পর্শ করে) সাত আটজন মেয়ে মণ্ডলাকারে নাচতে থাকে। অতিরিক্ত সংগীত শিল্পীরা নৃত্য শিল্পীদের আবর্তিত বৃত্তরেখা অনুসরণ করে কখনো লম্বালম্বি ভাবে, কখনো আড়াআড়ি ভাবে।

এদের পোষাক সাদামাটা। মেয়েরা লাল ব্লাউজ, হাঁটু পর্যন্ত লালপাড় সাদা শাড়ি সামনে তিন পাড়ের ভাঁজ দিয়ে পরে। কোমরে থাকে লাল শালু। এই লাল শালুকে স্থানীয় ভাষায় 'আলে' বলা হয়। পুরুষ বাদ্যযন্ত্রীরা রঙীন ধুতি, গেঞ্জী পরে থাকে। মেয়েদের হাতে বালা বা চুড়ি, গলায় হার ব্যবহার করতেও দেখা যায়। কখনও কখনও গলায় কাগজের মালাও পরতে দেখা যায়। খোঁপায় থাকে রঙীন ফুল বা পালক আর দলের অগ্রবর্তিনীর হাতে থাকে একটি কলস। মাথায় কলসীর ভারসাম্য রক্ষা করে, মাটি থেকে চোখ দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে কলস তুলতে হয়।

এই নৃত্য দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে কালীপূজা পর্যন্ত চলে। বেশির ভাগ সময়েই খাওয়া দাওয়ার পর সারারাত্রি ব্যাপী এই নৃত্য পরিবেশিত হয়।

এই নৃত্য সৃষ্টির কিংবদন্তী হল—

ত্রেতা কালে রামচন্দ্র লঙ্কা যুদ্ধে জয়লাভ করায় বানর কুল তাদের রোজকার ব্যবহৃত কাঁসার বাসনপত্র বাজিয়ে নৃত্যগীত করে আনন্দ উৎসব পালন করেছিল। তখন থেকে এই নৃত্য ধারা আদিবাসী সমাজে দুর্গাপূজার দশমীর দিনে রাবণ বধের উৎসবে আনন্দ নৃত্য হিসাবে চলে আসছে।

এছাড়া বহু বছর আগে বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভূম জেলার রামদাস টুডু নামে একজন ব্যক্তি প্রথম এই নাচের দল তৈরি করে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পরিবেশনও করেছিলেন।

পরবর্তীকালে আদিবাসী সমাজে এই নাচ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে আদিবাসী সমাজের সরেন, বাস্কে, টুডু বেসরা হাঁসদা, হেমব্রম—প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে এই নৃত্যের ধারা প্রবহমান।

এই নৃত্যে প্রচলিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে একটি কলি হল—

কচাটলা মালি বাহা
আমকুশি! বাহা কায়ে
পেরেচ; বাহা আকান, মন কুশি
বা হায় যে মনের পেরেচ।
বাংলারূপ ঃ—
পচা নোংরা জায়গায় এত সুন্দর
মালী ফুল ফুটেছে।
তুমি সুন্দর হওয়ার জন্য,
মাথার খোঁপায় ও তোমার
গলায় ওই ফুলের মালা
পরে নাও। —ড. তরুণ প্রধান

সারি ঃ সারিবদ্ধভাবে বসে একসঙ্গে সমবেত কণ্ঠে যে গান কাজ করতে করতে গাওয়া হয়, তাই সারি গান নামে পরিচিত। ধান কাটার গান বা অন্যান্য গোষ্ঠী সঙ্গীত যা গ্রামবাংলায় প্রচলিত তার সবগুলিই গাওয়া হয় বলেই সারিগান নামে প্রচলিত। তবে পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) নৌকা বাইচ খেলার প্রতিযোগিতায় সারিবদ্ধভাবে বৈঠার তালে তালে যে গান গায় তাই প্রধান সারিগান হিসাবে গণ্য। এ গানে থাকে উদ্দীপনা—নৌকা চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। পূর্ববাংলার ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের মাঝিদের কণ্ঠের সমবেত গান। ভাটিয়ালী যেমন টানা টানা সারি তেমন ছন্দবহুল। খাল, বিল, নদী-নালার বুকে অবিরাম বৈঠার তালে অপূর্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে এই উদ্দীপনামূলক সুর—

Scanned with CamScanner

"রূপসী নদীর নাও, সুজন মাঝির নাও,
তরতরাইয়া যায়,
কোন্ বা দ্যাশে উজান বাইয়া যায় রে।
আরে হেইসামাল হেইয়ো,
আরে তাগদ্ দিয়া বাইও,
ফুলমতী টিয়াধুটি পাছোত্
ফালাইয়ো। ইত্যাদি

দূরপাল্লার নৌকার সুদীর্ঘ যাত্রাপথ। জল শুধু জল। মন হয়ে ওঠে ব্যাকুল। তাই মাঝিরা গেয়ে ওঠে—

আমার একা যেতে ভয় করে
চলরে দুজন যাই পাড়ে,
আমার এদেহ পাষাণের সমান
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করল ফুলবাগান
ইত্যাদি

সারিগানে মাঝিদের জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগের কথাও শোনা যায়—

নাইওর ছাড়িয়া দেও মোর বন্ধু,
নাইওর ছাড়িয়া দেও,
একবার নাইর দোইলে ফইসকে
থুইয়া যাবে মাও হে
দাদায় আইছে তোমহার বাড়িতে
বন্ধু নাইওর ছাড়িয়া দেও,
একনজর দেখিয়া আইসি,
দয়াল বাপমাও॥

নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতায় জয়ের উল্লাস শোনা যায় সারিগানের মধ্যে। জয় করে ফিরে এসেছে প্রতিযোগীরা। এবার তাদের বরণ করে নেওয়ার পালা। তাই গ্রামের মা বোনদের ডেকে প্রতিযোগীরা গান গেয়ে বলছে—

জয় দেলো রামের মা
তর গোপাল আইছে ঘরে।
ধানদূর্বা, বরণডালা, দে গলুইর উপরে।
নাইরা বাইরা তর সোনার এ,
গোপাল নেলো ঘরে।
যেই দেবতার দয়ায় গোপাল ফিরা
আইল ঘরে,
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম
যাই তারে।

গোষ্ঠী সঙ্গীতগুলির মধ্যে পূর্ববাংলার সারিগান বাংলার লোকসঙ্গীতের আসরে বিরাট আসন জুড়ে আছে।

—বুদ্ধদেব রায়

সারিঞ্জা ঃ উত্তরবঙ্গের সঙ্গীতময় জগতের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাচীন লুপ্ত প্রায় লোক বাদ্য যন্ত্র হল সারিঞ্জা। উত্তরবঙ্গে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—

"সারিঞ্জা বাজায় সাউদ সওদাগর-
বাঁশী বাজায় চোর,
ব্যানা বাজায় ত্যানা পিন্দা
দোতরা হারাম খোর।"

তিনটি তার সহযোগে বাঁধানো থাকে সারিঞ্জা। মাথায় তিনটি কানের সঙ্গে তিনটি তার প্যাঁচানো থাকে। তারও শেষ প্রান্তে থাকে সারিঞ্জা হাড়ির মাথা। কোনটিতে মকর, ময়না টিয়া পাখি আবার কোনটিতে ময়ূর। সারিঞ্জা তৈরি হয় কাঠের। এই যন্ত্রটির নিচের দিকটি একটু মোটা আকৃতির হয়। এটি গোসাপের চামড়া দিয়ে 'ছান' (ছাউনী) করা থাকে। চামড়ার উপর একটি ছোট দণ্ড থাকে যা তিনটি তারকে সুরে বাঁধতে সাহায্য করে, তার নাম 'ঘোড়া'। উপরের দিকে কানের ঠিক আগে থাকে 'সরস্বতী' যা সুরটিকে শ্রুতি মধুর করতে সহযোগিতা করে। এই যন্ত্রটি বাজান হয় 'ছড়' দিয়ে। ছড়টি ধনুকের মত হয়। তৈরি হয় বাঁশের থাকে। ঘোড়ার ল্যাজের চুল না পেলে মেয়েদের মাথার লম্বা চুল ব্যবহৃত হয়। তিনটি তারের মাঝখানের তারটি বাঁধা হয় সরগমের মধ্যসপ্তকের 'সা'তে। তার নিচের তারটি তথা বামদিকের তারটি 'মা'তে আবার ডানদিকের তারটি বাঁধানো থাকে 'পা'তে, কোন কোন সারিঞ্জায় তিনটি তারকে সঙ্গীতের ভাষায় বলা হয় 'পা'=ব্যোম 'সা'=সুর এবং 'মা'=জিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সারিঞ্জার একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল এই যন্ত্র দিয়ে 'হরবোলা' খুব ভাল হয়। বিভিন্ন জীবজন্তুর ডাক যেমন কুকুরের ডাক, বেড়ালের ডাক, শিয়ালের

Scanned with CamScanner

বোলান (১) ঃ বর্ষশেষের রাঢ় বাংলার চৈতি-ফসল বোলান। বাংলার চিরায়ত চলমান ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে সে আমাদের সামাজিক জীবনকে দেয় পূর্ণতা। শৈব উৎসবের সঙ্গে অভিন্নতার সূত্রে তার স্বর-সুর বাঁধা। শিব ভারতীয় পুরাণে গণদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। তাই অনিবার্যভাবে লোকজীবন ও লোকবৃত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত এই বোলান লোকনাট্য। এর আঙ্গিক নাগরিকতার স্পর্শযুক্ত। আসলে বাংলার সাবেকী ঐতিহ্যের হাত ধরে গ্রামীণ মানুষের উৎফুল্ল মনের প্রকাশ ঘটেছে বোলানে।

বোলান গান প্রশ্নোত্তরের কৌশলে উপস্থাপিত। অনেকটা তর্জার মতো ছড়া কেটে বলা হয়। সঙ্গে থাকে নাচ। বোলানের বিষয় আগে ছিল পুরাণ আর ইতিহাস। এখন সেসব প্রায় বাতিলের মুখে। কেননা চটকদার সামাজিক নক্‌শা এসে তাদের জায়গা দখল করছে। বোলানের গানে দরিদ্র কৃষক জীবনের টুকরো ছবি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বোধহয় গণদেবতা শিবের উৎসব বলেই এতে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধের স্ফুরণ ঘটে অজান্তে। প্রতিবাদী চেতনার ছাপও বোলানে খুব সুস্পষ্ট। নিরন্ন, দুর্গত শোষিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় এ গান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি যোগায় বোলান।

বোলানের লোক শিল্পীরা অসরে অর্ধবৃত্তের মতো দাঁড়ায়। একই সঙ্গে চলতে থাকে নাচ আর গান। বাজে ঢাক-ঢোল-ঝাঁঝরী-গঙ্গ-সারিন্দা-করতাল-মাদল-ঝুমঝুমি-সানাই। এদেরই মিলিত সুর শেষ বসন্তের মাতাল হাওয়ার পথে পথে মুখর হয়ে ফেরে। জাগিয়ে রাখা গাঁয়ের মানুষের সহজ উদ্দীপনাকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই আসে বোলানের রসিক শ্রোতা আর আমুদে দর্শক হয়ে। এ গান রাঢ়ের জনজীবনের শিকড়ে গিয়ে নাড়া দেয়।

বোলান সঙ্গীতবহুল লোকনাটক। হাঁটা-চলার মধ্য দিয়ে সংলাপ বলা হয় গানে। মূল অভিনেতা বা গায়ক থাকেন বড়জোর চারজন। বাকিরা দোহারের ভূমিকায়। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে গলা মেলায় কিশোর অভিনেতা অথবা বয়স্ক কোন মেয়েলী-পুরুষ। এর পালাকার, সুরকার, শিল্পী সবাই প্রায় সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষ। বোলানের প্রকারভেদও আছে অনেক—দাঁড়ানে, ছল, সাঁওতেলে, পোড়ো —আরো কত কী। বোলানের নির্দিষ্ট কোন সুর নেই। প্রচলিত লোকগীতি, বাউল, কীর্তন কখনো বা জনপ্রিয় ফিল্মীগানের সুরেই গীত হয়। মাটির সুরভি থেকে ঘ্রাণ নিতে নিতে লোকজ সুরের ঝর্নাধারায় নেয়ে বোলান হয়ে ওঠে রাঢ়ের দেহাতী মানুষের প্রাণের উৎস।

—ড. সনৎকুমার নস্কর

বোলান গান (২) ঃ চৈত্র সংক্রান্তির মরশুমে এ বঙ্গের সর্বত্র নানাবিধ উৎসব হয়ে থাকে—গাজন তার অন্যতম। অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন স্থানে নানারূপ বিনোদন পদ্ধতির মধ্যে বোলান গান হল এক বিশিষ্ট মাধ্যম। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-স্টেশন সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে এই প্রকরণটি দেখা যায়।

এর উৎপত্তি নিয়ে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেননা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে নৃত্য-গীত-অভিনয়—এই তিনের সমাবেশ হওয়ায় নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বহু বিবর্তিত রূপে আজ তা এইরূপে এসেছে—এ প্রকার অনুমান করা হয় এবং আগামী দিনে তা আরো পরিবর্তিত হতে পারে—একথা ভাবাও অসঙ্গত নয়। কেননা গ্রামীন অনুষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে ভাল-মন্দ গ্রহণ করে নিজের

Scanned with CamScanner

প্রকরণটিকে সমৃদ্ধ করে বলেই প্রতিটি প্রকরণের মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায়।

বোলান গানের প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় বন্দনা গান—যা সহজেই আজও গ্রামীণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এর শেষাংশে কখনও দল সদস্যদের পরিচয় ব্যক্ত করা হয়। এর পর বোলানের প্রকৃত অংশ গান—অর্থাৎ পালা। সরল বেশবাসে পাঁচালী জাতীয় কবিতায় এই অংশ গীত হয়। পৌরাণিক বিষয়ের প্রচলন আলাদা থাকলেও এখন শুরু হয়েছে সামাজিক-প্রশাসনিক বিষয়ও। গানের পর পাঁচালী—এখানে তত্ত্ব ব্যাখ্যা সংলাপ উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়। একেবারে শেষে রং পাঁচালী—এতক্ষণের গুরুগম্ভীর ভাব ত্যাগ করে সাম্প্রতিক কোন লঘু অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে অল্প-বয়সীদের নৃত্য-গীত সম্পন্ন অনুষ্ঠান।

গানের দলগুলি একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করে। ফলে একই গ্রামে একাধিক দলের আগমন হয়। সমাজের উচ্চবর্ণ এতে অংশগ্রহণ না করলেও, পরোক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা করে ও এর আনন্দ অনুভব করে। ইদানীং শিক্ষিত ব্যক্তিই এই বোলান গানের রচনা করেন কবিতায়, কখনও তিনি দল গঠন করেন। এই দলে যন্ত্রী সংঘ থাকে। সবই অস্থায়ী। গ্রীষ্মের কৃষি কর্মের অবকাশে তারা দল তৈরি করে এজন্য গ্রামে তারা বিশেষভাবে সম্মানিত হয়। আর্থিক ব্যয় বহন করে স্থানীয় লোকেরাই। প্রয়োজনে বাদ্যযন্ত্র ভাড়া করা হয়। তবে গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা এই অনুষ্ঠানে ততটা যুক্ত হয় না। ডাক বোলানের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পরে বোলানের আরো কতকগুলি স্বল্প প্রচলিত রূপের নাম বলা যেতে পারে—দাঁড়ানে বোলান, ছল বোলান, সাঁওতেলে বোলান, পোড়ো বোলান প্রভৃতি। তবে এগুলি নিতান্তই সীমিত অঞ্চলে প্রচারিত। ডাক বোলান ইদানীং যাত্রার মত হতে চলেছে—পৌরাণিক কাহিনী তত গৃহীত হচ্ছে না। রং পাঁচালী অংশের সঙ্গে আলকাপের সাদৃশ্য আছে। আগামী দিনে বোলান আরো পরিবর্তিত হতে পারে।

— শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক

বোলান গান (৩) ঃ চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে রাঢ় বঙ্গের একটি লোকায়ত উৎসবের নাম 'বোলান'। বোলানের আভিধানিক অর্থ বোল বা ডাক বা সাড়া হলেও বোলান প্রেমী গ্রামীণ মানুষের কাছে তা আনন্দ অনুষ্ঠান হিসাবেই গৃহীত। বোলান মূলত সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর অনুষ্ঠান। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক অতীতেও অন্ত্যজরা ছিল সমাজচ্যুত। তদানীন্তন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা ছিল অপাংক্তেয়। যেমন কোনো মানুষের ধর্মহীন অস্তিত্ব অকল্পনীয় তেমনি কৃষ্টিহীন কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর বিকাশলাভও সম্ভব নয়। তাই কৃষ্টিমনস্ক এই অন্ত্যজরা তাদের কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্ররূপে এই উৎসবটিকে বেছে নিয়েছিল। কারণ শিব উচ্চ শ্রেণীর চেয়েও বেশি কাঙ্ক্ষিত দেবতা, নিম্নশ্রেণীর কাছে।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে বোলানকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (১) শ্মশান বেলান, (২) দাঁড়া বোলান, (৩) সাঁওতেলে বোলান, (৪) পালা বোলান, (৫) ছল বা রঙ পাঁচালী।

কোনো বছর চৈত্রমাসের দিনসংখ্যার ভিত্তিতে ২৭ অথবা ২৮শে চৈত্র 'শ্মশান বোলান'এর যাত্রা শুরু। শ্মশান বোলানের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বলা হয় 'শ্মশান ভক্ত'। বোলানের দিন শ্মশান ভক্তরা হবিষ্যি করেন। বিকালে সকলে কুমোর পাড়ায় যায় 'মুখ-লেখা' করতে। মুখে নীল রঙ মেখে

Scanned with CamScanner

তার ওপর লাল ও হলুদের নক্সা কেটে নাকে নথ, কানে দুল, মাথায় দীর্ঘ পরচুলা এবং লাল অথবা কালো ঘাঘরা পরে কেউ সাজে শ্যামা কালী, কেউ শ্মশান কালী, কেউ শকুনি আবার কেউ বা সাজে শিয়াল-কুকুর অথবা ভূত-প্রেত। এরপর সকলে মিলিত হয় পূর্ব সংগৃহীত মড়ার মাথা যেখানে সংরক্ষিত আছে সেই নির্জনতম গুপ্ত স্থানে। মড়ার মাথাকে ঘিরে ভক্তরা বসে। প্রতি দলে একজন ওস্তাদ থাকেন। মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে তিনি প্রত্যেকের 'শরীর বন্ধন' করেন, যাতে না অন্য কোন দলের ওস্তাদ এই দলের সদস্যদের কোনো ক্ষতি করতে পারে। ধূপ জ্বালিয়ে, মড়ার মাথার মুখে মদ-মাংস দিয়ে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে ওস্তাদ মড়ার মাথাটিকে জাগিয়ে তোলেন। প্রসাদ হিসেবে সেই দিশী মদ প্রত্যেকে খায়। এরপরই যেন ভক্তদের শরীরে কোনো কিছু ভর করে। তারা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত। হাতে তুলে নেয় যে যার অস্ত্র (রামদা, কুঠার, তরোয়াল ইত্যাদি) মড়ার মাথা হাতে হনহনিয়ে এগিয়ে চলে নিজের গ্রামের শিবতলার দিকে। তাদের আসতে দেখে শিবতলার প্রধান পুরোহিত ধূপ জ্বালিয়ে ও গঙ্গা জল ছিটিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যায়। অভ্যর্থনা পর্ব সমাপ্ত হলে সকলে মিলে শিবতলায় এসে পৌঁছোয়। শিবতলায় আগে থাকতেই থাকে চড়কের ঢাক। শুরু হয় ঢাকের আওয়াজে মড়ার মাথাকে ঘিরে শ্মশান ভক্তদের শ্মশান খেলা। যার অন্যতম আকর্ষণ হল 'শকুনি নাচ'। শ্মশানে বা ভাগাড়ে পড়ে থাকা মড়ার ওপর শকুনি যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাংস খোবলা খোবলা করে ছিঁড়ে খায় এবং মাঝে মধ্যেই ব্যাঘাতকারী শিয়াল-কুকুরের দিকে যেমনভাবে সে তেড়ে যায় এখানেও ঠিক সেরকমটি প্রদর্শিত হয়। মাথাটিকে নিজের দখলে আনার জন্য ভক্তদের নিজেদের মধ্যে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। দখলকারী ভক্ত মড়ার মাথাটিকে নিজের দুই দাঁতের পাটির মাঝখানে কামড়ে ধরে ঢাকের আওয়াজের তালে শুরু করে উদ্দাম নৃত্য। এক শিবতলা থেকে আর এক শিবতলায় গিয়ে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত চলে শ্মশান খেলা। পরে গঙ্গার ঘাটে সকলে উপস্থিত হয়। মড়ার মাথায় গঙ্গা মাটি চাপিয়ে তাতে আঙুল দিয়ে লিখে দেওয়া হয় 'রাম-নাম'। এরপর ধূপ জ্বালিয়ে মড়ার মাথার মুখে মিষ্টান্ন জাতীয় কিছু দিয়ে মাথাটিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে ভক্তদের সকলে গঙ্গায় স্নান সেরে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

'দাঁড়া বোলান' মূলতঃ গীতিনৃত্য। প্রতি দলে একজন মূল 'গায়েন' থাকেন। মূল গায়েনকে সাহায্য করে 'দোহারী।' বোলান দলের সদস্যরা লাঠি হাতে দু'দলে ভাগ হয়ে পরস্পরের বিপরীত মুখে দাঁড়িয়ে আসরে ঘুরে ঘুরে গান করে। একদল যখন গান গায়, অন্য দল তখন অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করে। দাঁড়া বোলান রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত হলেও বর্তমানে তা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিও সমদৃষ্টিসম্পন্ন। দাঁড়া বোলান আবার বন্দনা, পালা, পাঁচালী ও পয়ার এই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। পালা অংশে দুই-তিন বা সাত-আটটা গানের এক একটা পালায় কোনো কাহিনী বা ঘটনার বর্ণনা করা হয়। পাঁচালী অংশে একটি মাত্র গানে পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ গানটির সার সংক্ষেপ করা হয়। পয়ার অংশে কবি এবং দলের দলপতি ও মুহুরির নাম উল্লেখ করে তাদের গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়।

'সাঁওতেলে' দলের সদস্যদের পরনে থাকে শর্টস, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, মাথায় ফেটি, তাতে থাকে বিভিন্ন রঙের পালক।

Scanned with CamScanner

কোমরে থাকে চামড়ার বন্ধনী। তাতে থাকে ছোট ছাট ঘণ্টা, যার আওয়াজ দূরের লোককে জানিয়ে দেয় তাদের আগমন বার্তা। সাঁওতেলে বোলান মূলতঃ যৌথনৃত্য এবং এতে শারীরিক উদ্দামতাই প্রকট। তাই দলে যুবকদেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

'পালা বোলান' কিছুটা যাত্রাপ্রধান। পালা বোলানের শিল্পীদের তাই ভালোরকম অভিনয় দক্ষতার দরকার হয়। পালা বোলানের বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হলেও বর্তমানে তা সামাজিক সমস্যাবলীর দিকেও গভীর মনোযোগী। পালা বোলান বন্দনা গান দিয়ে শুরু করে ক্রমে তা বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে।

রাত জাগা বোলান প্রিয় গ্রামীণ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে 'ছল' বা 'রঙ পাঁচালী'র জন্য। এর জন্য স্বতন্ত্র কোনো দলের প্রয়োজন হয় না। বোলান শেষে প্রত্যেক দলের দলপতি তার কয়েকজন বাছাই করা শিল্পীকে নিয়ে 'ছল' বা 'রং' পরিবেশন করে। যেমন মেয়েকে কেন্দ্র করে শাশুড়ী জামাই-এর ঝগড়া। এক প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে দুই প্রেমিকের বচসা। মাকে বাবা কেমন করে ভালোবেসে বিয়ে করলো তাই নিয়ে বাবাকে ছেলের জিজ্ঞাসা ইত্যাদি।

বোলান দলে ছেলেরাই মেয়ে সাজে। গানের সুর হয় সিনেমার সুরে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সঙ্গে থাকে ঢাক, ঢোল, খঞ্জনি, ব্যাগ-পাইপ, ফ্লুট, তাসা, হারমোনিয়াম প্রভৃতি। নিজের নিজের শিবতলায় হ্যারিকেন বা হ্যাজাকের আলোয় বোলান প্রদর্শিত করার পর শুরু হয় তাদের অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা। কখনো কখনো তিন-চারদিন ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরে বোলান গায়। দিশী মদ হয় তাদের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার সঙ্গী। —সুবন্ধু মণ্ডল

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ঃ ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ভারতীয় তথা বঙ্গীয় লোকসাহিত্যের এক অন্যতম সৃষ্টি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোককথা অপেক্ষা বঙ্গীয় জনসমাজেই যে তার অধিক সমাদর, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বের রূপকথার চরিত্রগুলির মধ্যে যে সব প্রাণীর ব্যবহার আছে আলোচ্য ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ঠিক তাদের মত নয়। রূপকথার পরী যেমন পশ্চিমী রূপকথায় ভালোমন্দ মিশিয়ে তৈরি হয়ে কাহিনীর মধ্যে নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরি করে, কিন্তু বঙ্গীয় কাহিনীতে তার ব্যবহার একান্ত শুভবাচক বলেও তা মূলতঃ শুভবাচক চরিত্র। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীও প্রায় সে জাতীয় শুভবাচক চরিত্র।

যে পাখি কথা বলে মানুষের মনের ভাব বুঝতে পারে, তাদের জীবনের নানা শুভাশুভ ব্যাপারে চিন্তা করে,—এই লক্ষণ নিয়েই গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় রূপকথার এই প্রাণী দুটি। প্রয়োজনে এরা অপরের জন্য প্রাণত্যাগও করে—এমনকি গৃহস্থকে সদুপদেশ দেওয়াও তার একটি কাজ। তাদের দার্শনিক চিন্তা বা বুদ্ধিমত্তা মানুষকে মুগ্ধ করে। রূপকথায় শুক-শারীর যে ভূমিকা আলোচ্য প্রাণীটি প্রায় সেই জাতের।

কাহিনী যখন জটিল আবর্তে দিশেহারা তখন এরা সেই সমস্যার জট খুলে দেয় বুদ্ধিহারা রাজাকে সদুপদেশ দেয়, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ জাতীয় ঘটনার সঠিক সমাধান আনে। এর দ্বারা শ্রোতা বা পাঠকের এক প্রকার তৃপ্তি হয় এবং কাহিনী নির্মাতাও যে একপ্রকার স্বস্তির শ্বাস ফেলেন তা বলাই বাহুল্য।

আরব্য উপন্যাসে যে পাখি দেখা যায়—অতিকায় যার শরীর তারাও অনেক সমস্যার সমাধান করে কাহিনীকে গতিসম্পন্ন করেছে বা চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছে—ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী কিন্তু সে জাতীয় কাজে যুক্ত হয় না। —শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক

Scanned with CamScanner